গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ২০ - ২৬ মার্চ, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কার্ল মার্কস স্মরণদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৪ মার্চ মহান কার্ল মার্কসের স্মরণদিবস। ওই দিন কলকাতায় এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস স্বপন ঘোষ, মানব বেরা, অশোক সামন্ত ও অন্যান্যরা।

বিপন্ন চাষিদের আত্মহত্যার মিছিল

মন্ত্রীরা বলছেন, সব ঠিক আছে

আত্মহত্যাই করতে হবে হয়ত— ঘোলাটে দৃষ্টিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আবদুল্লা মোল্লা। হুগলির জামপুর গ্রামের আলু চাষি। তাঁর দেড় বিঘা জমির আলু মাঠেই পড়ে রয়েছে ডাঁই হয়ে। স্ত্রী মারা গেছেন। দুই ছেলেকে কোনও রকমে খাওয়ানোর সম্বলটুকু ছিল জমির ফসল, প্রাণের ধন আলু। তা বিক্রির কোনও উপায় না পেয়ে দিশাহীন অবস্থা তাঁর। রাজ্য জুড়ে অসংখ্য আলু চাষির বাস্তব পরিস্থিতিটাই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল যেন।

ন্যায্য দামে আলু বিক্রি করতে না পেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে গত এক সপ্তাহে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন ৭ জন কৃষক। আলুর ফলনে বিখ্যাত হুগলি, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া— প্রভৃতি জেলাতে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও কৃষিবিপণন মন্ত্রীও নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলে কৃষক আত্মহত্যার জন্য কৃষকদেরই দায়ী করেছেন। বলেছেন, আত্মহত্যার জন্য আলুর দাম না পাওয়া দায়ী নয়, কারও ক্ষেত্রে বলেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওর কোনও ঋণ ছিল না, কোনও ক্ষেত্রে বলেছেন, মৃত্যুর কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান। এ সব শুনতে শুনতে কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ছিল। বিগত সরকারের আমলেও অবিকল একই বিবৃতি শোনা যেত মন্ত্রীদের মুখে। এমনকী অবৈধ সম্পর্কজনিত কারণে এই ধরনের মৃত্যু ঘটেছে বলে কুৎসা করতেও তাঁদের আটকাত না।

গত বছর কম ফলন হওয়ায় ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে বহু আলুচাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ বার বেশি ফলনেও আলু বিক্রি করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। সরকারের একথা অজানা ছিল না যে, এ বছর আলু উৎপাদন বেশি হতে চলেছে। এ কথাও সরকার জানত, প্রত্যেক বছর হিমঘরে আলু রাখার বন্ড চাষিদের হাতে না গিয়ে তা বড় বড় ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। বন্ড নিয়ে চলে ফাটকার কারবার। সরকার যদি আলুচাষিদের বাঁচাতে চাইত তাহলে সরাসরি আলুর বন্ড চাষির হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রশাসনকে দিয়ে অনেক আগেই করতে পারত। এ

হুগলির বৈঁচিতে জি টি রোডে আলু পুড়িয়ে চাষিদের অবরোধ

ছাড়াও অনেক আগেই সহায়কমূল্য ঘোষণা করে কৃষিদপ্তর বা সরকারি সমবায় সংস্থার মাধ্যমে চাষির কাছ থেকে আলু কেনা শুরু করতে পারত। অভাবি বিক্রি শুরু হয়ে আলুচাষিদের আত্মহত্যার মিছিল শুরুর জন্য তারা অপেক্ষা করে বসে থাকল কেন! সরকার যতদিনে সহায়ক মূল্য ঘোষণা করল ততদিনে বেশিরভাগ হিমঘর বড় ব্যবসায়ীদের আলুতে ভর্তি হয়ে গেছে, চাষি আলু নিয়ে মাঠে বসে আছে। পচে গিয়ে সব আলু নষ্ট হওয়ার ভয় তাদের তাড়া করছে। কখন সরকারি লোক আসবে তার অপেক্ষায় দিন গোনার উপায় তাদের নেই। ফড়েরা যে দাম দেবে সেই দামে আলু বেচতে তারা বাধ্য। কিন্তু এ সব দেখেও সরকারের কোনও হেলদোল নেই কেন? কারণ, এ দেশের কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারে যে দলই থাকুক তারা ভোটের সময় কৃষকের জন্য যত মায়াকান্না কাঁদুক, এরা সকলেই অসাধু বৃহৎ ব্যবসাদার, মহাজন, ফড়ে, কালোবাজারির টাকার থলির ওপরেই নির্ভরশীল। তাই

সাতের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে অ্যাবেকার দিল্লি অভিযান

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন 'অ্যাবেকা' 'দিল্লি চলো' অভিযানের ডাক দিল। আগামী ৭ এপ্রিল জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিল, বিদ্যুৎ মাশুলে কেন্দ্রের ২০ শতাংশ ও রাজ্যের ৩০ শতাংশ ভরতুকি এবং কয়লা কেলেঙ্কারির নায়কদের কঠোর শাস্তি সহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কয়লায় ৫০ শতাংশ ছাড়ের দাবিতে দিল্লিতে হবে ঐতিহাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ। এই আন্দোলনকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য ৮ এপ্রিল রাজেন্দ্র ভবন হলে অনুষ্ঠিত হবে সর্বভারতীয় কনভেনশন। উপস্থিত থাকবেন বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক 'মেইনস্ট্রিম' পত্রিকার সম্পাদক সুমিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট জননেতা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-দলের পলিটব্যুরো সদস্য কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

২০০৩ সালে সমস্ত প্রচলিত বিদ্যুৎ আইন বাতিল করে তৎকালীন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার নয়া বিদ্যুৎ আইন রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে পার্লামেন্টে যে খসড়া পেশ করেছিল, সেই খসড়ার উদ্দেশ্য যে জনস্বার্থ রক্ষা নয় 'অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) তখনই তা দেখিয়েছিল। পরবর্তীকালে খসড়াটিকে আইনে পরিণত করবার জন্য গঠিত পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেস নেতা সন্তোষ মোহন দেব এবং অন্যতম সদস্য সিপিএম নেতা বাসুদেব আচারিয়ার কাছে অ্যাবেকা বার বার ছুটে গিয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কথা গ্রহণ

দুয়ের পাতায় দেখুন

রানাঘাট ঃ সভ্যতার লজ্জা

রানাঘাটের কনভেন্ট স্কুলের 'মাদার সুপিরিয়র' সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে গণধর্ষণের পৈশাচিক ঘটনা ঘটল ১৩ মার্চ রাতে। নতুন করে ধাক্কা দিয়ে গেল গোটা দেশের মানুষকে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের। এ কোন সমাজ! কোন পরিবেশে জন্ম নিল, বেড়ে উঠল এই নরপশুরা — বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীরও যাদের বিকৃত লালসার হাত থেকে রেহাই নেই! সাথে সাথে গুরুতর প্রশ্ন উঠে গেল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা,

বীভৎস ঘটনার সংবাদ প্রকাশ পেতেই কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও।

১৩ মার্চ রাতে নদীয় জেলার রানাঘাটের গাংনাপুরে একটি কনভেন্ট স্কুলে হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে স্কুল ভাঙচুর করে লুঠতরাজ চালায় তারা। স্কুলের অধ্যক্ষা, ওখানকার আবাসনেরই বাসিন্দা সত্তরোর্ধ্ব এক সন্ন্যাসিনী তাদের বাধা দিতে গেলে চরম পাশবিকতায় তাঁর উপর চড়াও হয় এই নরপিশাচরা। চলে গণধর্ষণ। পরে সন্ন্যাসিনীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

পরদিন সকালে এলাকার মানুষ খবর পেয়ে স্কুল চত্বরে জড়ো হন। এই ঘৃণ্য ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েন তাঁরা। জনতা রেললাইন এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। যোগ দেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও। এলাকার মানুষের অভিযোগের তির পুলিশের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে।

এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ১৪ মার্চ এস ইউ সি আই (সি) কৃষ্ণনগরে প্রতিবাদ মিছিল করে এবং জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেয়। ১৫ মার্চ রাজ্য জুড়ে এলাকায় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সরকারি মদতে মদ ও অশ্লীলতার যে ঢালাও প্রসার চলছে, যার প্রভাবে সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতি পদে বিপন্ন হচ্ছে, অবিলম্বে তা বন্ধ করার দাবি জানান তিনি।

অ্যাবেকার দিল্লি অভিযান

একের পাতার পর

না করে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' পার্লামেন্টের তৎকালীন প্রতিনিধিদের সমর্থনে বিনা বাধায় পাশ হয়। এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহককে সংগঠিত করে ২২ মার্চ ২০০৫ দিল্লিতে ঐতিহাসিক বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল এই সংগঠন। তৎকালীন বিজেপি সরকার, পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার এবং এ রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এ আইনকে শুধু মেনে নিয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু সোচ্চারে বলেছিল, এই আইন চালু হলে, (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, (২) বিদ্যুতায়নের কাজ ২০০৭ সালের মধ্যে শেষ হয়ে সকলের ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে যাবে, (৩) সমস্ত বিদ্যুৎ পর্ষদগুলো কোটি কোটি টাকা লোকসান থেকে মুক্তি পাবে, (৪) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, গৃহস্থ ন্যায্য দামে সুলভে বিদ্যুৎ পাবে, (৫) বিদ্যুৎ শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে, (৬) বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতি ঘটবে, লোডশেডিং-লো ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হবে, (৭) মাশুল নির্ধারণ থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রাহকদের মতামত নিয়ে করা হবে, যাতে গ্রাহকস্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, (৮) এমনকী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করে কোম্পানির বেয়াদপি বন্ধ করার জন্য ওমবাডসম্যানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে বলে আইনে বলা হল। সংবাদমাধ্যমগুলি প্রচার চালাতে লাগল, সংস্কারের জুড়ি গাড়ি চড়ে এবার উন্নয়ন এল বলে। বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে দিয়ে, বেসরকারিকরণ করে, বিদ্যুৎ শিল্পে স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করে কোম্পানিগুলির মুনাফার পাহাড় তৈরি করার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই আইনের আসল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সরকারের ভর্তুকির দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে বৃহৎ শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ মাশুল কমিয়ে আদিবাসী প্রধান অঞ্চল, জঙ্গলমহল, পাহাড় এলাকা, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা কৃষক, গরিব মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র শিল্পের গ্রাহকদের লাগামহীন মাশুল বৃদ্ধি ঘটানোই এই আইনের লক্ষ্য।

বিগত কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ২০০৭ সালে এই আইনের আরও সংশোধন করেছে। এবার মোদি সরকার আরও সংশোধনের প্রস্তাব এনেছে। পূর্বতন যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বলেছিলেন, অন্য বিষয়গুলিতে ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনও মতেই বিদ্যুতে ভর্তুকি দেওয়া চলবে না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতে ভর্তুকি প্রায় উঠে গিয়েছে বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে একটা মিথ্যা প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে যে, ভর্তুকি দিলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পপতিদের অঢেল ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জনসাধারণকে কোনও ভর্তুকি দিতে তারা রাজি নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিদ্যুতে ভর্তুকি কোনও অনুৎপাদক ব্যবস্থা নয়। এর দ্বারা কৃষিতে, ক্ষুদ্র শিল্পে উদ্যোগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাই এই ভর্তুকি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি লাগামহীনভাবে মাশুল বাড়তে থাকলে তা কমাবার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। বিদ্যুৎ মাশুলে কেন্দ্রকে ২০ শতাংশ এবং রাজ্যকে ৩০ শতাংশ ভর্তুকি দিতে হবে।

স্বাধীনতার পরে দেশের মানুষকে ক্ষুধার্ত এবং অর্ধনগ্ন রেখে তাদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্সের পয়সায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলো বা বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে উঠেছিল। মানুষের আশা ছিল, এর ফলে আধুনিক যুগের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার বিদ্যুৎ পেতে সুবিধা হবে। উন্নয়ন ঘটবে দেশের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের এবং গরিব-মধ্যবিত্ত, পার্বত্য এলাকা ও জঙ্গল মহলের পিছিয়ে পড়া মানুষের। গড়ে উঠবে আধুনিক উন্নত সমাজ। দারিদ্র, বেকারি, ক্ষুধার জ্বালা থেকে মুক্ত হবে ভারতবাসী। এখন এই আইনের মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থে তৈরি সেই সম্পদ অত্যন্ত অল্প টাকার বিনিময়ে তুলে দেওয়া হয়েছে একচেটিয়া মালিকদের হাতে। এই বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে কী পেয়েছি আমরা? দেশ হারাল শত শত কোটি টাকার সম্পদ। বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার 'বিদ্যুৎ' চলে গেল ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে। উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে গেল পণ্য। এখন 'ফেল কড়ি মাখ তেল', অর্থাৎ পয়সা থাকলে বিদ্যুৎ পাবে, না হলে অন্ধকারে পচে মরো। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মাধ্যমে একটি বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে তিনটি কোম্পানি করা হয়েছে, আবার সংশোধনী এনে চারটি করার চেষ্টা

চলছে। আগে একটি বিদ্যুৎ সংস্থার মাধ্যমে সব হত। তার ৩ শতাংশ অতিরিক্ত আয় ছিল আইনি বিধান। আর এখন চারটি কোম্পানি ন্যূনতম ১৬.৫ শতাংশ করে মুনাফা বা রিটার্ন পাবে। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে চারটি কোম্পানি মিলিয়ে ৬৬ শতাংশ মুনাফা বা মাশুল বৃদ্ধি। এই আইনের সুরক্ষা কবচ নিয়ে প্রতিটি বিদ্যুৎ কোম্পানি প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা মুনাফা লুটছে।

২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে গড় বিদ্যুৎ মাশুল ছিল প্রতি ইউনিট ২৭৬ পয়সা। এই ১২ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫৮ পয়সা। কৃষক বিনা পয়সায় যে বিদ্যুৎ পেত, তা হয়েছে ৩৫৪ পয়সা প্রতি ইউনিট। যে ক্ষুদ্র শিল্পে বিদ্যুৎ ছিল ৫০ পয়সা প্রতি ইউনিট, তা হয়েছে প্রায় ১০ টাকা। বিদ্যুৎ শিল্পের মালিকরা পেয়েছে একচেটিয়া শোষণের অধিকার। তাহলে কার উন্নতি হয়েছে এই বিদ্যুৎ আইনের মাধ্যমে!

২০০৭ সালের মধ্যে বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০১৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫০ শতাংশ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গড়ে ৬০ শতাংশ বিদ্যুতায়নের কাজ হয়েছে। কেন এমন হল? বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর মুনাফার টাকা দিয়ে কি বিদ্যুতায়নের কাজ হয়েছে? তা কিন্তু নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে টাকা ঢেলে বিদ্যুতায়ন করে ওদের ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এ তো জাতীয় অপচয়! বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ অনুযায়ী বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির দায়িত্ব ছিল সঠিক পরিষেবা দেওয়া। কিন্তু তাও তারা করছে না। গ্রাহক, সরকার, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সকলকেই তারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। এর ফলে লোডশেডিং, লো ভোল্টেজ চলছে। তার নেই, মিটার নেই, মিটার খারাপ, মিটার রিডিং নেই, ট্রান্সফর্মার নেই। এমনকী মান্ধাতার আমলের কাঠের খুঁটিতে লাইন দেওয়া চলছে জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেই। এইরকম অতি নিম্নস্তরের পরিষেবা সত্ত্বেও এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। ছাঁটাই, লে-অফ করে কর্মী কমিয়ে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে বা অস্থায়ী কর্মী দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে যা জনস্বার্থ বিরোধী। এর ফলে নিচু মানের কাজ হচ্ছে, দুর্নীতি বাড়ছে। উৎপাদন খরচ যা কমানোর কথা ছিল তা একটুও কমেনি। বেড়েই চলেছে। নানা অজুহাতে মাশুল বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোম্পানিগুলোর নিম্নস্তরের পরিষেবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার যে আইন রয়েছে তাও লোকঠকানো। গ্রাহকদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য তৈরি হয়েছে 'ওমবাডসম্যান'। সেই ওমবাডসম্যান-এর আদেশ কার্যকর করতে বাধ্য নয় কোম্পানি, কিন্তু গ্রাহক বাধ্য! গণতান্ত্রিক উপায়ে কোর্টে বিচার চাইবার অধিকার গ্রাহকদের নেই বললেই চলে। কিন্তু কোম্পানিগুলোর রয়েছে পূর্ণ অধিকার। তাই পরিষেবার উন্নতি নেই, ক্ষতিপূরণ দেওয়া নেই, আছে ভুতুড়ে বিলের অত্যাচার, লাইন কেটে গ্রাহককে হেনস্থা করা। তাতেও না হলে বিদ্যুৎ চুরির মিথ্যা অভিযোগে স্বৈরাচারী আইন প্রয়োগ করে গরিব চাষি, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহককে ডকে তোলার ব্যবস্থা করেছে বিদ্যুৎ কোম্পানি। আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হচ্ছে নির্যাতিত, বিপর্যস্ত গ্রাহকদের। হাসতে হাসতে এই নিপীড়ন কোম্পানিগুলি চালিয়ে যাচ্ছে এই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-কে হাতিয়ার করে।

উৎপাদন খরচ কমিয়ে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিকে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ শতাংশ কম দামে কয়লা খনি বণ্টন করেছে। দীর্ঘ বছর ধরে তা নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি। ভারতের সর্ববৃহৎ দুর্নীতি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারির কথা আজ আর কারও অজানা নেই। অ্যাবেকা ১৯৯৮ সাল থেকে এই দুর্নীতির কথা সংবাদমাধ্যম, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে বলে আসছে। কিন্তু বিজেপি বা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের বিগত বামফ্রন্ট সরকার, এমনকী তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান রাজ্য সরকারও, বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তার প্রধান কারণ, এই বিরাট কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত আছে একচেটিয়া শিল্পপতিরা, সমাজের রাঘব বোয়ালেরা। তাই বড় বড় সংবাদমাধ্যমও টুঁ শব্দ করেনি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে একটু নড়াচড়া শুরু হতেই আবার দুর্নীতির সংবাদে হতচকিত মানুষ! এবার বিদ্যুৎ ও কয়লা মন্ত্রীর সচিবের ঘরের তালা খুলে এই মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও ডকুমেন্ট উধাও! এবারও সংবাদমাধ্যমগুলি 'এটা নতুন ঘটনা নয়' বলে এত বড় ঘটনাকে চাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। খোদ মন্ত্রীর ঘর থেকে ফাইল চুরি কী করে সম্ভব হল, এই ফাইল চুরির সাথে কাদের স্বার্থ যুক্ত, একবার ভেবে দেখুন। 'স্বচ্ছ' মোদি সরকারের ঘরে এ কী অস্বচ্ছ কাজ চলছে?

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে কয়লা ব্লক বণ্টনে দুর্নীতি হয়েছে এবং যে সব বিদ্যুৎ, সিমেন্ট উৎপাদক কোম্পানি এর সাথে যুক্ত, তাদের উত্তোলিত কয়লায় টন প্রতি ২৯৫ টাকা পেনাল্টি দিতে হবে। কারণ এই সব একচেটিয়া শিল্পপতিরা সরকারের কাছ থেকে ৩০ শতাংশ কম দামে কয়লাখনি নিয়ে সেই কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার না করে বেশি দামে বাইরে বিক্রি করে নিজেদের পকেট মোটা করেছে। আর এর ফলে বিদ্যুতের দামও বেড়েছে হু হু করে। এই সব দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির দাবি দেশের মানুষের মধ্য থেকেই উঠছে। দাবি উঠেছে নাম প্রকাশ করতে হবে এই সব দুর্নীতিবাজদের। 'স্বচ্ছ' মোদি সরকার সে পথে না হেঁটে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কয়লা ব্লকে ভর্তুকি তুলে দিয়ে 'বিডিং' বা নিলামে কয়লাখনি বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে নিলামে খনি বণ্টন হলে তা ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম বাড়তে বাধ্য।

এতেই থেমে থাকেনি মোদি সরকার। সদ্য পেশ করা রেল বাজেটে কয়লা পরিবহণের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে ১০ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেটে সার্ভিস ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে ১০ শতাংশ। এমনিতেই প্রতিটি গৃহস্থ পরিবার, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকের প্রাণান্তকর অবস্থা। তার উপর এই আক্রমণ। যার ফল দাঁড়াবে ন্যূনতম ২০ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধি। বিগত কংগ্রেস সরকার জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩-কে সংস্কারের নামে সংশোধন করেছিল ২০০৭ সালে, ২০১৪ সালে আবার সংশোধনের জন্য পেশ করেছে। সেই খসড়া আরও সংশোধন করে চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল-২০১৪। এ ব্যাপারে পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কী সেই সংশোধনী? জনগণকে সরকার জানিয়েছে কি? কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'গণতান্ত্রিক' দায়িত্ব পালন করেছে! কত বড় ধাপ্পাবাজি একবার ভেবে দেখুন! একটি শিল্প, যা আগে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলছিল, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মাধ্যমে তাকে আগেই বেসরকারিকরণ করে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টনে বিভক্ত করা হয়েছে। এবারকার সংযোজন হল 'সাপ্লাই' ব্যবসা। বাজার-সংকটে জর্জরিত বেশি সংখ্যক শিল্পপতি যাতে কম টাকা বিনিয়োগ করে লুটেপুটে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বিলে। এই বিল পার্লামেন্টের পরের অধিবেশনে তোলা হবে। এ বিল পাশ হলে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়বে নতুনভাবে। এ ছাড়াও জনস্বার্থবিরোধী বহু বিষয় রয়েছে এই 'বিদ্যুৎ বিল ২০১৪'-র পাতায় পাতায়।

বিগত ১২ বছরের অভিজ্ঞতায় এ কথা পরিষ্কার যে, 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিল করা আশু প্রয়োজন। প্রয়োজন, 'বিদ্যুৎ বিল ২০১৪' যাতে পার্লামেন্টে পাশ না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কানে এ কথা পৌঁছে দেওয়া যে, মাশুল বাড়লে তার দায় কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। কেন্দ্রকে ২০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারকে ৩০ শতাংশ ভর্তুকি দিতে হবে। কয়লা কেলেঙ্কারি ও ফাইল কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের শাস্তি দিতে হবে। রেল বাজেট থেকে কয়লা পরিবহণের বর্ধিত মাশুল এবং সাধারণ বাজেট থেকে কয়লার উপর সার্ভিস ট্যাক্স প্রত্যাহার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অ্যাবেকা ডাক দিয়েছে, 'চলো দিল্লি'। ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে ৮ এপ্রিল সর্বভারতীয় কনভেনশন ঘোষণা করবে সর্বভারতীয় আন্দোলনের কর্মসূচি। গড়ে তোলা হবে ভারতব্যাপী আন্দোলন।

সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের ভেবে দেখা দরকার

পূর্বতন শাসক সিপিএম দলের বহু কর্মীই এখন দলের পরিণতি দেখে চরম হতাশ। 'সারা জীবন কী করলাম' বলে অনেকে চোখের জলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। পরপর নির্বাচনে পরাজয়, বিশেষত সর্বশেষ বনগাঁ লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের বিপর্যয়, ঐ দলের কর্মী-সমর্থক তো বটেই, সাধারণ মানুষের একটা অংশকেও ভাবাচ্ছে যে, সরকারি ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই সিপিএমের ভোট তথা সমর্থন এমন দ্রুত কমছে কেন? শুধু তাই নয়, দু'দিন আগেও যাঁরা বিভিন্ন জেলায় সিপিএমের পরিচিত নেতা ও মুখ ছিলেন, তাঁরা কী করে দক্ষিণপন্থী তৃণমূল এমনকী ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছেন? এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বামপন্থী রাজনীতির স্বার্থেই সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

যতদিন সরকার ছিল, বিধানসভা-লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত তো বটেই, এমনকী স্কুল কমিটির নির্বাচনেও ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। সরকার হাতছাড়া হতেই যেন তাসের ঘরের মতো দলের সমস্ত শক্তি ভেঙে পড়ল। তবে কি সিপিএমের এত বিরাট শক্তি বামপন্থী দল হিসাবে ছিল না? সরকারে থাকলে আর পাঁচটা বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দল যেমন করে সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখাতে পারে, কিছু কিছু সুবিধা দেয়ও, আবার বিশেষ সুবিধাভোগী একদল ভোট নিয়ন্ত্রণকারী মাতব্বর তৈরি করে, সিপিএমের শক্তির ভিত্তিটা কি সেরকমই ছিল? না হলে, একটি যথার্থ বামপন্থী দলের প্রতি সমর্থন কি নির্বাচনে হার-জিতের উপর শুধু নির্ভর করে? এখনও যে সমর্থন ও সাংগঠনিক শক্তি তাদের অবশিষ্ট রয়েছে, রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে, বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে নেতৃত্ব এই শক্তিকে আন্দোলনে নামাতে পারছেন না কেন? বিভিন্ন সভায়-সম্মেলনে নেতারা কর্মীদের জনস্বার্থ নিয়ে আন্দোলনে নামার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আন্দোলনে কেউ নামছে না। কোনও একটি দল নানা কারণে নির্বাচনে হারতে পারে, একটি বামপন্থী দল তাতে আন্দোলন-প্রতিবাদের শক্তিও হারিয়ে ফেলবে কেন? এমন বহু প্রশ্নই দলের কর্মী-সমর্থকদের মনে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু কর্মীরা সদুত্তর পাচ্ছেন না। কখনও ভাবছেন নেতাদের ভুলের জন্যই এটা ঘটছে, কখনও অন্য কোনও কাল্পনিক কারণকে দায়ী করছেন। ভাবছেন, নেতাদের পাল্টালেই বোধহয় দলের এই দুরবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আবার এক দল নেতা বলছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে যারা চিহ্নিত হয়ে গেছে, এলাকায় এলাকায় নানা অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে বদনাম রটেছে, তাদের সরিয়ে দিলে বোধহয় দল আবার মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ফিরে পাবে, হারানো শক্তি ফিরে পাবে। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি এটা শুধু নেতৃত্ব বদলের বিষয় বা দুর্নীতিগ্রস্তদের সরিয়ে দিলেই কাজ হবে? নাকি দলের যে চিন্তা-প্রক্রিয়া, নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ নেতা-কর্মীদের এই পথে ঠেলে দিয়েছে, একদিনের সৎ, সমাজপরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা তরতাজা কর্মীকে অসৎ, নীতিহীনে পরিণত করেছে, সেই মূল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গলদ রয়েছে। এই প্রশ্নগুলি আজ ভেবে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

অনেকেরই স্মরণে আছে, গত শতকের পাঁচের দশক থেকে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল এ রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের উজ্জ্বল অধ্যায়। প্রথম দিকে অবিভক্ত সিপিআই, ১৯৬৪ সালের পর সিপিএমের সংগ্রামী ভূমিকা ছিল। যদিও তারা কখনও যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না। কিন্তু যখন তাঁরা সরকারি ক্ষমতায় ছিল না, তখন যেভাবে গণআন্দোলনে পুলিশের ও গুণ্ডাদের মার খেতে, প্রয়োজনে পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়াতেন, পরবর্তীকালে ১৯৬৭-র প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক হিসাবে সিপিএমের সদস্য সংখ্যা যখন বহুগুণ বাড়ল, সেই অর্থে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ল, তখন আর আগের মতো মিলিট্যান্ট আন্দোলনে তাঁদের দেখা গেল না। ১৯৬৭ এবং '৬৯ সালে যখন এ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়, তখন সরকার পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের সাথে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিরোধ দেখা দেয়। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, পার্লামেন্ট সম্পর্কে যেহেতু জনগণের মোহ আছে, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত না হচ্ছে ততক্ষণ জনগণকে মোহমুক্ত করার জন্য কমিউনিস্টরা নির্বাচনে যাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই যদি বামপন্থীরা কোনও একটি রাজ্যে সরকারে যায় তবে কীভাবে সরকার পরিচালনা করবে, এই প্রশ্ন সেদিন আসেনি। লেনিনও কিছু বলে যাননি। এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এ ব্যাপারে গাইড লাইন দিয়ে বললেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে, ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার নামে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকে সে পুলিশ দিয়ে দমন করবে না। সিপিএম সহ যুক্তফ্রন্টের অন্যদলগুলি প্রথমে মানতে না চাইলেও পরে এস ইউ সি আই (সি) যখন জানায় এটা না মানলে সরকারে যোগ দেবে না, তখন বাধ্য হয়ে মানতে রাজি হয়। যদিও শেষপর্যন্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পদে পদে তারা অন্তরায় সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও যতটা কার্যকর করা গিয়েছিল, তাতে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন জোরদার হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণি, কায়েমি স্বার্থবাজ ও জোতদারদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সালের মাত্র কয়েক মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার জবরদস্তি এই সরকার ভেঙে দিলে ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয় এবং তা মূলত শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনমুখী নীতির ফলেই।

১৯৭৭ সালে এস ইউ সি আই (সি)-কে বাদ দিয়ে সিপিএম অন্য দলগুলিকে নিয়ে সরকার গঠন করে এবং 'বামফ্রন্ট' নাম নিলেও বাস্তবে দেশের আর পাঁচটা বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলের মতোই সরকার চালাতে থাকে। অতীতের যুক্তফ্রন্ট সরকারের গণআন্দোলনমুখী নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলিকে পুলিশ দিয়ে দমন করে, কথায় কথায় বাস-ট্রামের ভাড়া বাড়ায়, প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ শুরু করে। অন্য দিকে দলের মধ্যে আগে যতটুকু বামপন্থী রাজনীতির চর্চা হত, শ্রমিক আন্দোলন-গণআন্দোলনের চর্চা হত, সেটুকুও পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দলের শক্তির ভিত্তি বামপন্থী রাজনীতির পরিবর্তে দাঁড়িয়ে গেল সরকার-পঞ্চায়েত-পুরসভাগুলির পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, পুলিশ আর সমাজবিরোধী। গণআন্দোলনের পরিবর্তে যে কোনও উপায়ে ভোটে জেতাকেই বামপন্থার জয় হিসাবে নেতারা দেখাতে থাকলেন। তার জন্য রিগিং, ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, যথেচ্ছ অর্থশক্তির ব্যবহার, সমাজবিরোধীদের ব্যবহার— কোনও কিছুতেই পিছপা হলেন না। বহু ছাত্র-যুবক, যাঁরা অনেক স্বপ্ন নিয়ে, অনেক কিছু ত্যাগ করে এক সময় পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলেন, দলের এই রাজনীতির কারণে, তাঁরা বিপ্লবী কর্মীতে পরিণত হওয়ার বদলে গোঁড়া, অসহিষ্ণু, রুচি-সংস্কৃতি বর্জিত দাপুটে মাতব্বর হিসাবে এলাকায় পরিচিত হয়ে উঠলেন। দুর্নীতি-স্বজনপোষণ লাগামছাড়া হয়ে দেখা দিল। মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে ঘৃণা এবং ভয় করতে থাকল। শ্রমিক-কৃষক সহ যে গরিব জনগণ ছিল বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি, তারা এই উদ্ধত, অহঙ্কারী, বামপন্থী রাজনীতি ও গণআন্দোলন বর্জিত সিপিএম নেতা-কর্মীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকল। দলে শ্রেণিসংগ্রাম, বামপন্থার চর্চা না থাকায় নেতা ও কর্মীদের মধ্যেও পচা-গলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রভাব ও চর্চা বাড়তে থাকল। পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের সাথে নেতাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল। নেতা-মন্ত্রীরা বেপরোয়াভাবে মালিকদের স্বার্থরক্ষায় নেমে পড়লেন। এর নিকৃষ্ট রূপ দেখা গেল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে। পরিণতিতে ক্ষমতাচ্যুত হল সিপিএম। লোকসভা ভোটে আসনসংখ্যা দুইয়ে নেমে এল।

সংগঠনের যতটা শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে, দলের নেতারা তাকেও যে আজ আন্দোলনের ময়দানে নামাতে পারছেন না, তার কারণ, সরকারে না থাকায় দলের কর্মীরা মনে করছেন তাঁদের আর কোনও 'পাওয়ার' বা ক্ষমতা নেই। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের শাসনে নেতারা কর্মীদের 'পাওয়ার' বলতে তো সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতি ও গণআন্দোলনের শক্তি নয়, সরকারি ক্ষমতাকেই বুঝিয়েছেন। এই 'পাওয়ার' দেখিয়েই তাঁরা নানা সংগঠনে লক্ষ লক্ষ সদস্য জোগাড় করেছেন। আজ সরকার চলে যেতেই সেই সদস্যদের অনেকেই রাতারাতি শিবির বদলে ফেলেছেন। একটি দল যথার্থই বামপন্থী হলে তার 'পাওয়ার' কখনও সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হতে পারে না। তার আসল পাওয়ার হল বামপন্থী রাজনীতি, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি, শ্রমিক-কৃষক সহ শোষিত-নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে গণআন্দোলন। এগুলির কোনও কিছুরই চর্চা দলে না থাকায় সরকার থেকে সরে যাওয়া মাত্র এখনও বহু সংখ্যায় সদস্য-সমর্থক থাকা সত্ত্বেও দল 'শক্তিহীন' হয়ে পড়েছে। ফলে আজ তৃণমূলের আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো দূরের কথা, হুমকির সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও দলটির আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই।

অন্যদিকে এতদিন দলকে যাঁরা ভোট দিতেন, সেই সমর্থক মানুষদেরও নেতারা কোনও দিন রাজনীতি বোঝাননি। বামপন্থী রাজনীতির সাথে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির পার্থক্য কোথায়, যথার্থ সেক্যুলারিজম কী, সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মনন বলতে কী বোঝায়— এ সব কোনও কিছুই তাঁরা বোঝাননি। পাশাপাশি নানা কুসংস্কার, সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো, যেটা বামপন্থীদেরই কাজের অঙ্গ, তা-ও তাঁরা করেননি। শুধু বলেছেন, আমরা সরকারে আছি, আমাদের হাতে পাওয়ার আছে, আমরাই অনেক কিছু দিতে পারি, ফলে আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদের ভোট দাও। অর্থাৎ শুধু পাওয়ারে থেকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিই বুঝিয়েছেন। ফলে সমর্থক-সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকী নেতা-কর্মীদের মধ্যেও যথার্থ বামপন্থী, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মনন গড়ে ওঠেনি। দলে থাকতে থাকতেই বহু নেতা-কর্মী ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় রীতি, আচার-আচরণ পালন করে গেছেন। দলটি প্রথম থেকেই যথার্থ মার্কসবাদী না হওয়ায় দলে ব্যক্তিগত জীবন আর রাজনৈতিক জীবন আলাদা থেকে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনে আচরণের মধ্যে কী বিরোধ রয়েছে, তার ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থাও দলে ছিল না। ক্ষমতার রাজনীতির পিছনে ছুটতে গিয়ে অনেক সময় তাঁরা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতাকেও ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ফলে দলে হিন্দু পরিবার থেকে আসা বেশ কিছু সদস্য ও সমর্থক মানসিকতায় হিন্দু থেকে গেছেন, মুসলমান সদস্য ও সমর্থক জনগণও অনেকে মুসলমান থেকে গেছেন। আজ যখন বিজেপি-আর এস এস জোট দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলছে, তাতে প্রভাবিত হয়ে একদল 'হিন্দু-সিপিএম' চলে যাচ্ছে বিজেপির দিকে, নিরাপত্তার কথা ভেবে আর এক দল 'মুসলমান-সিপিএম' সরকারি দল তৃণমূলের দিকে ঝুঁকছে।

এ কথা সিপিএম কর্মীদের ভেবে দেখতে বলব যে, বামপন্থী একটি দল চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিজেপির মতো জঘন্য সাম্প্রদায়িক দল রাজ্যে জায়গা করতে পারছে কী করে? কোথাও কোথাও ভোটে সিপিএমের পরিবর্তে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান দখল করছে কী করে? সংগ্রামী রাজনীতির চর্চা থাকায় যে বাংলায় একদিন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস জায়গা করতে পারেনি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো হিন্দু মহাসভার নামকরা নেতা জায়গা করতে পারেননি, আজ সেখানে এসব ঘটছে কী করে? সিপিএম নেতারা যদি বামপন্থী রাজনীতির চর্চা করতেন, কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বামপন্থী মানসিকতা গড়ে তুলতেন তা হলে সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ রাজ্যে পা রাখার জায়গা পেত কি? রাজ্যে চৌত্রিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট নাম নিয়ে যে সরকারটি ছিল, তা যদি সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় ও আদর্শে পরিচালিত হত তবে তো রাজ্যে বামপন্থী রাজনীতি আরও শক্তিশালী হত, বামপন্থার প্রতি শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের ভালোবাসা-আকর্ষণ আরও বেড়ে যেত। বামপন্থী হিসাবে দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসাও বাড়ত। তা হওয়ার পরিবর্তে জনগণের মধ্যে সিপিএম দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি ক্ষোভ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ব্যাপক রূপ নিল। সমাজজুড়ে রুচি-সংস্কৃতির ভয়াবহ অবনমন ঘটল। নানা ধরনের অপসংস্কৃতি, খুন, ধর্ষণ, নারীপাচার ব্যাপক আকার নিল।

বামপন্থী হিসাবে তাঁদের সংস্পর্শে এলে তার প্রভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে রুচি-সংস্কৃতি-নৈতিক মান উন্নত হওয়ার কথা। বাস্তবে তা ঘটল না। বরং যাঁরা যুক্ত হলেন, তাঁদের মানের আরও অবনতি ঘটল। সিপিএমের নামের পাশে মার্কসবাদী লেখা দেখে তাকে একটি মার্কসবাদী দল ধরে নিয়ে যাঁরা ওই দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন, দলটির বাস্তব ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ মার্কসবাদ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন, দলটির নামের পাশে যতই মার্কসবাদের কথা লেখা থাকুক, দলটির গড়ে ওঠার অমার্কসবাদী পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের দাবি নিয়ে জেলায় জেলায়
এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্মেলন

বাঁকুড়া ঃ অধিগৃহীত জমিতে কর্মমুখী শিল্প স্থাপন, স্থায়ী কাজে ঠিকা চুক্তি নিয়োগ বন্ধ, অসংগঠিত শ্রমিকদের কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ বন্ধ, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার, পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, শ্রম আইন ভঙ্গকারী মালিকদের কঠোর শাস্তি প্রভৃতি দাবিতে বাঁকুড়া শহরের ডি ও সি হলে ১ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি-র তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নির্মাণকর্মী, মোটরভ্যান চালক, আশা, লিংকম্যান, টি ডি, সরকারি ক্ষেত্রের স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মচারী, ওয়াটার ক্যারিয়ার স্যুইপার কর্মচারী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ও দলের জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। জেলা সম্পাদক কমরেড বি বসাক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পাঠ করেন। প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত প্রতিনিধিরা।

বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউট হল

পুরুলিয়া সম্মেলনে প্রতিনিধিদের একাংশ

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গৌরীশংকর দাস বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে কমরেড কে মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড বি বসাককে সম্পাদক করে ২৮ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে ১ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি-র উঃ ২৪ পরগণা জেলা ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। জুট, রেল, ব্যাঙ্ক, বিড়ি শ্রমিক, পোস্ট অফিস কর্মচারী, নির্মাণ কর্মী, অনিয়মিত কর্মচারী, মোটরভ্যান চালক, সরকারি কর্মচারী সহ মোট ১৯৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড অমল সেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড সমর সিনহা, কমরেড অশোক দাস, রেল কর্মচারী ফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা কমরেড অজিত কুণ্ডু এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর সমস্ত সেক্টরের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। কমরেড অমল সেনকে সভাপতি এবং কমরেড প্রদীপ চৌধুরীকে সম্পাদক করে মোট ২৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কোলাঘাট বিদ্যাসাগর মুক্ত মঞ্চে শ্রমিক সমাবেশ

পুরুলিয়া ঃ এ আই ইউ টি ইউ সি-র পঞ্চম পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮ মার্চ। রঘুনাথপুর পৌরসভা কমিউনিটি হলে প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড সমর সিনহা, কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড দীপক দেব এবং এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। শহরের কোর্ট চত্বরে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড ডি কে মুখার্জীকে সভাপতি ও কমরেড প্রবীর মাহাতকে সম্পাদক করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ হোসিয়ারি, বিড়ি সহ অসংগঠিত শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ও নিরাপত্তা, আশা, সি এইচ জি, আই সি ডি এস, ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপারদের স্থায়ী করা, চুক্তি শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ, মোটরভ্যানের লাইসেন্স প্রভৃতি দাবিতে ৭ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় কোলাঘাট বিদ্যাসাগর মুক্ত মঞ্চে। সহস্রাধিক শ্রমিক-কর্মচারী সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় বিভিন্ন পেশার শ্রমিক নেতারা বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন কমরেড ফণিভূষণ চক্রবর্তী। মেছেদা বিদ্যাসাগর লাইব্রেরির রোকেয়া হলে প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে কমরেড ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে সভাপতি ও কমরেড মধুসূদন মান্নাকে সম্পাদক করে ২২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বর্ধমান ঃ ৮ মার্চ দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক শ্রমিক এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজেদের জীবন ও জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী, প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা। সম্মেলন থেকে কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী সম্পাদক এবং কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী সভাপতি নির্বাচিত হন।

মোটরভ্যান চালকদের সম্মেলন

৭ মার্চ সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দুর্গাপুর মহকুমা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র বর্ধমান জেলা কমিটির সহ সভাপতি কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য এবং সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বপতি চ্যাটার্জী। দুর্গাপুর মহকুমা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে পরেশ বাউরি ও টুটুল দাস।

শিক্ষা ও কাজের দাবিতে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

নদিয়া ঃ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু, সকল বেকারকে ভাতা, অবিলম্বে এস এস সি পরীক্ষা গ্রহণ এবং সমস্ত চিটফান্ডে আমানতকারীদের টাকা ফেরত সহ ৯ দফা দাবিতে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে ১০ মার্চ ছাত্র-যুবকরা জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাসুদেব সামন্ত। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেডস অঞ্জন মুখার্জী, শীতল দে, বিমান কর্মকার, শম্পা শিরিন প্রমুখ।

৯ মার্চ বহরমপুর শহরে ছাত্র-যুব বিক্ষোভ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ঃ ৮ মার্চ ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র দুশোর বেশি কর্মী-সমর্থক দক্ষিণ বারাসাত মোড় অবরোধ করে। তাদের দাবি অবিলম্বে পদ্মেরহাট ও নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে, জয়নগর-কলকাতাগামী বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে, সিভিক পুলিশদের চাকরির নামে হয়রানি বন্ধ করতে হবে, চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত ও দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। পাশফেল চালু করতে হবে। বক্তব্য রাখেন ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সুশান্ত ঢালি, জেলা সভাপতি রামকুমার মণ্ডল এবং ডিওয়াইও-র পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ইলিয়াস মোল্লা।

১০ মার্চ কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভ

পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া শহর এবং রঘুনাথপুরেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। শূন্যপদে নিয়োগ, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ও সিলেবাসে অবৈজ্ঞানিক বিষয় অর্ন্তভুক্তি বন্ধ করা, ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধের, ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ৯ মার্চ ছাত্র-যুব কর্মীরা রঘুনাথপুর শহরে বিক্ষোভ দেখায় ও পুরুলিয়া-বরাকর রোড অবরোধ করে। ১০ মার্চ একই দাবিতে পুরুলিয়া শহরের টাটা-রাঁচি রোড অবরোধ হয়। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ছাত্র সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিকাশ কুমার ও যুব সংগঠনের জেলা ইনচার্জ কমরেড সোমনাথ কৈবর্ত।

গবেষণায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি গবেষকদের

২৬ ফেব্রুয়ারি 'ডেমোক্রেটিক রিসার্চ স্কলার অরগানাইজেশন'-এর নেতৃত্বে কয়েক'শ গবেষকের এক মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় যায়। গবেষণায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়ানো এবং গবেষকদের স্কলারশিপের পরিমাণ বাড়ানো প্রভৃতি দাবি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

নদিয়ার কনভেন্ট স্কুলে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিনিধিরা

নদিয়ার কনভেন্ট স্কুলের সত্তরোর্ধ্ব শিক্ষিকা সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণের ভয়াবহ ঘটনায় সারা দেশ আলোড়িত। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ১৫ মার্চ ঘটনাস্থলে যান, আহত সন্ন্যাসিনী যে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তার সুপারের সাথে দেখা করেন, দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। অন্য দিকে অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র গুপ্ত, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অধ্যাপক শাহনওয়াজ খান প্রমুখ।

ছবি ঃ স্কুলের গেটে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও অন্যান্যরা

শোষণ-বৈষম্যের অবসানই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চেতনা

ঘোষণা বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চেতনাকে ধারণ করে সব ধরনের শোষণ-বৈষম্য-নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাল বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র। ৮ মার্চ, ১০৫ তম নারী দিবস উপলক্ষে ৬ মার্চ ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে এই আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুলতানা আক্তার রুবি এবং সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। পরে তোপখানা রোডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় নারী দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রধান বক্তা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদীর)-র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দর চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রও প্রতি বছর এই দিবসটি পালন করে। কিন্তু যে সময়ে এই নারী দিবস পালিত হচ্ছে সে সময় নারী দিবসের ইতিহাসকে ম্লান করে দেওয়ার জন্য বাহারি পণ্যের ব্যবসা চলছে। বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র নারী দিবসের চেতনার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। নারী দিবস যে শোষণ মুক্তির চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে চায় সেই চেতনাকেও ভয় পায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণি। বক্তারা বলেন, এখন গোটা বিশ্ব জুড়ে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। মানুষ বেকার হচ্ছে, খাদ্যের অভাবে মানুষ মরছে, শ্রমিক ছাঁটাই চলছে, কৃষক আত্মহত্যা করছে, বেশিরভাগ মানুষ সম্পদহারা হচ্ছে। অন্যদিকে বেশিরভাগ সম্পদের মালিক হচ্ছে এক ভাগ মানুষ, যারা গোটা বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যুদ্ধ বাধিয়ে নারী-শিশু হত্যা চলছে, চলছে অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা। মনুষ্যফার পাহাড় গড়ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্ট কোম্পানিগুলির শ্রমিকদের সিংহভাগ নারী। তাঁদের নেই ন্যূনতম মজুরি, নেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ, নেই মাতৃত্বকালীন ছুটি। প্রায় ২০ লাখেরও বেশি শ্রমিক গৃহকর্মে ১২-১৬ ঘন্টা শ্রম দেয় যাদের বেশিরভাগ কিশোরী। শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, শ্রম ঘন্টা বা নিরাপত্তা ও সাপ্তাহিক ছুটি কোনওটিই নেই তাঁদের। চা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে যে নারীরা কাজ করেন তাঁদের রয়েছে মজুরি বৈষম্য। সম্পত্তিতে নারীদের সমানাধিকার নিশ্চিত হয়নি। গার্হস্থ্য শ্রম এখনও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। নারী নির্যাতন-পাচার-হত্যা-খুন-ধর্ষণ-গণধর্ষণ-যৌতুকের কারণে হত্যা-অশ্লীল ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে ব্লাকমেলের অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিদিন। প্রতি বছর এদেশ থেকে ৪০-৫০ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। নারী জীবনের এই শোষণ-বঞ্চনা-অপমানের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি। বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র নারী দিবসের চেতনাকে ধারণ করে সকল ধরনের শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করছে।

৮ মার্চ ইডেন কলেজ ও বদরুন্নেসা কলেজে সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রানাঘাটে বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে

১৬ মার্চ বহরমপুর শহরে বিক্ষোভ

রাজ্যে রাজ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

আসাম ঃ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এ দিন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির কুমার ভাস্কর নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মহিলাদের উপচে পড়া সমাবেশে কর্মসূচির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এ আই এম এস এস রাজ্য কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক বর্ণালী শর্মা। সমাবেশে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোহাঞি, শিক্ষাবিদ ডঃ রেণু দেবী এবং অধ্যাপক প্রীতি বরুয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি)-র আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বলেন, দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নারী নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও বাস্তবে নারীর উপর সংঘটিত অপরাধ দিনে দিনে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে নারী নির্যাতনের অবসানের জন্য কেবলমাত্র সদিচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্যার মূল কারণ উদঘাটিত করে সঠিক নীতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভা পরিচালনা করেন আসাম রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড ইনা হুসেন।

৮ মার্চ পাটনায় বিক্ষোভ

ত্রিপুরা ঃ নারী দিবসে আগরতলার বটতলায় বিভিন্ন দাবিতে মহিলারা গণঅবস্থান করেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী নির্যাতন-পাচার-ধর্ষণ প্রতিরোধ করা, সর্বত্র মহিলাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সম কাজে সম মজুরি দেওয়া, সিনেমা-টি ভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রদর্শন বন্ধ করা, মদ-জুয়া ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রসার বন্ধ করা প্রভৃতি।

৮ মার্চ কোচবিহারে মিছিল

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শেফালি চৌধুরী, সভাপতি কমরেড শিবানী দাস, সদস্য কমরেড শুক্লা চক্রবর্তী এবং এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ৮ মার্চ সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে কলকাতার পাঁচটি জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের লক্ষ্য পূরণে আজ করণীয় কী, সে প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডের সভায় বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড কল্পনা দত্ত। শরৎ পাঠাগারের সভায় আলোচনা করেন জেলা সম্পাদক কমরেড রুনা পুরকাইত। বেহালা ১৪নং বাসস্ট্যান্ডে ও ফলতায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে এ দিন মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিয়ে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে নারী পাচার ও কেনাবেচার যে ব্যবসা চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে এ দিন জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত মহিলারা স্টেশন চত্বরে সমবেত হন। সেখান থেকে মিছিল করে কোর্ট চত্বরের সামনে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্য। অন্যান্য জেলাতেও নারীদিবস পালিত হয়।

৮ মার্চ শিলিগুড়িতে মিছিল

সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ঃ যৌথ যুব কনভেনশন

বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির আহ্বানে ৩ মার্চ কলকাতার ভারতসভা হলে 'সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও যুব সমাজ' বিষয়ে এক যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড সুকান্ত শিকদার ও কমরেড প্রতীপ দাশগুপ্ত যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন। খসড়া প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই এফ আই-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, এ আই ওয়াই এল-এর কমরেড সুদীপ্ত চক্রবর্তী, এ আই ওয়াই এফ-এর কমরেড মৌনী ভট্টাচার্য এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমানে মোদি সরকার যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সারা দেশের জনমানসে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রসার, হিন্দুত্বের নামে সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করা, বৈদিক গণিত বা পৌরাণিক কাহিনীকে প্রকৃত বিজ্ঞান, ইতিহাসের সাথে গুলিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা মোদি সরকার চালাচ্ছে তার পরিবর্তে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

মানিকতলা ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে ২৭ ফেব্রুয়ারি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সমাজকর্মী ডঃ মহুয়া নন্দ। বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক বীরেন্দ্ররঞ্জন রায়, বাসুদেব দত্ত, রাজাবাজার বায়তুলমাল-এর সম্পাদক জসিমুদ্দিন সাহেব ও সারা বাংলা ১২৫ তম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মবার্ষিকী কমিটির বিশিষ্ট সদস্য অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন রাজাবাজার বায়তুলমালের সভাপতি খুরশেদ আলম, অধ্যাপিকা সুস্মিতা বসু চক্রবর্তী।

এম বি বি এস-এর একদিনে দু'রকম ফলপ্রকাশে দুর্নীতির ইঙ্গিত স্পষ্ট

১১ মার্চ রাজ্যের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেখল তাদের এম বি বি এস ফাইনাল প্রফেশনাল পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল একবার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হল। অবাক কাণ্ড, তার আধঘন্টার মধ্যে সেই ফল ওয়েবসাইট থেকে মুছে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফল প্রকাশ করা হল, দেখা গেল দুই দফা ফলের মধ্যে বিস্তর গরমিল। প্রথমবার অনার্স পেয়েছিলেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। অথচ দ্বিতীয়বারে সেই অনার্স সবারই কেটে গেছে।

এখানেই শেষ নয়। দেখা গেল কিছু জনের নম্বর বেড়ে গেছে। অভিযোগ দ্বিতীয় দলের এই ভাগ্যবানরা আশ্চর্যজনকভাবে সবাই শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের নেতা বা কর্মী।

১২ মার্চ এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার সংগঠনের রাজ্য দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, এই ঘটনা বারবার ঘটছে। তিনি বলেন, রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েই প্রত্যাহৃত হওয়ার পর এক ছাত্র স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামককে ফোন করে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছিল — এমন ঘটনা বারবার কেন হচ্ছে? কিন্তু নিয়ামক ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বেগের বিষয়টা উড়িয়ে দিতে বলতে থাকেন, 'তোমরা এস ইউ সি আই (সি)-র ছেলেগুলো তো! তোমরা ফোন করবে না।' ফোনের অডিও রেকর্ডিং সাংবাদিকদের শোনানো হয়। শোনা যায় পরীক্ষা নিয়ামক স্বীকার করছেন কিছু জনের নম্বর পরে বাড়ানো হয়েছে।

ডাঃ মৃদুল সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে তুলে ধরেন একইভাবে ২০১৩ সাল, ২০১৪ সালে এম বি বি এস এবং বি ডি এস পরীক্ষায় প্রথমে ফল প্রকাশ করে দিয়ে তারপর তা পাল্টে দেওয়া হয়েছে বিশেষ কিছু টি এম সি পি নেতাকে পাশ করানোর জন্য। তিনি দেখান, ২০১৩ সালে এম বি বি এস ফার্স্ট প্রফেশনাল পরীক্ষায় এস এস কে এম মেডিকেল কলেজে টি এম সি পি নেতা আব্দুস সোয়েম ফেল করেছিল। অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ফল প্রকাশের পর সমস্ত নিয়ম ভেঙে তাকে পাশ মার্কসিট দেয়।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল দন্ত চিকিৎসকদের পরীক্ষা বি ডি এস-র সেকেন্ড প্রফেশনাল পরীক্ষার সাপ্লিমেন্টারির ফল। পরদিন সেই ফল বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাহার করে। তারপর আবার তা প্রকাশিত হলে দেখা যায় সবার ফল অপরিবর্তিত শুধু উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজের টি এম সি পি নেতা অনিমেষ ঘোষ ফেল থেকে পাশ হয়ে গেছে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদিও সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন কোনও কারচুপি এর মধ্যে নেই, প্রথমবার অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হওয়ায় পরে তা প্রত্যাহার করে নতুন ফল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বারবার এমন অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে কী করে? এবং কী করেই বা শাসকদলের আশীর্বাদপ্রাপ্তরা তাতে উপকৃত হচ্ছেন তার কোনও সদুত্তর তাঁরা দেননি।

এ আই ডি এস ও নেতৃবৃন্দ জানান, এস এস কে এম মেডিকেল কলেজে ২০১৪ সালে এম বি বি এস থার্ড প্রফেশনাল পার্ট টু-র সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় টি এম সি পি নেতা সৌমাভ চ্যাটার্জী এবং শুভজিৎ দত্ত টুকলি সরবরাহ করছিল এই ঘটনার ভিডিও ছবি সহ ভবানীপুর থানায় অভিযোগ করা হয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের হাতে দেওয়া হয়। অথচ সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নেননি। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান সমগ্র বিষয়টি তাঁরা এম সি আইকে জানানোর পাশাপাশি আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং প্রয়োজনে আদালতেও যাবেন।

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির কলকাতা জেলা সম্মেলন

শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা আক্রমণ এবং শিক্ষার গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৮ মার্চ টাকী গভঃ হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে (শিয়ালদহ) অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দু'শোর বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন পরিচালনা করেন অধ্যাপক অনিলকুমার ঘোষ। প্রধান বক্তা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন, আজ যেমন শিক্ষার অধিকার বিপন্ন, তেমনই শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও বিপন্ন। মানুষের চিন্তা-চেতনাকে মেরে দিতে শাসকরা শিক্ষাকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা প্রেম শর্মা, অধ্যাপক মনোজ গুহ, অধ্যাপক দেবব্রত বেরা প্রমুখ। সভায় শিক্ষার অধিকার হরণ ও শিক্ষক নিগ্রহ, সিলেবাস, ভর্তি সমস্যা, নারী নিগ্রহ এবং আংশিক সময়ের শিক্ষক-অধ্যাপক ও এস এস সি-র শিক্ষক পদপ্রার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলন থেকে অধ্যাপক তরুণ দাসকে সভাপতি এবং শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ধর্মঘট করলেন নিউমার্কেটের দোকানদাররা

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের বঞ্চনা ও উদাসীনতার প্রতিবাদে নিউমার্কেট এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার দোকানদার ১১ থেকে ১৩ মার্চ ৭২ ঘন্টা দোকান বন্ধ সফল করলেন। এই বনধে সামিল ছিল এস এস হগ মার্কেট, (উভয় কমপ্লেক্স), ফিরপোস মার্কেট, সিটি মার্ট, বার্ট্রাস স্ট্রিট, হুমায়ুন প্যালেস, ফিনউইক বাজার স্ট্রিট, চৌরঙ্গি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ সমগ্র লিন্ডসে স্ট্রিটের প্রায় পাঁচ হাজার স্থায়ী বৈধ দোকানদার। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে এবং মেয়রকে বারবার চিঠি দিয়ে এবং মিটিং করে দোকানদারদের সমস্যাগুলি জানানো সত্ত্বেও হীন রাজনৈতিক স্বার্থে মেয়র সেগুলির সমাধান করেননি।

এই বনধের দাবি ছিল, মার্কেটগুলিতে খরিদ্দার ও দোকানদাররা যাতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখা, খরিদ্দারদের গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট পার্কিং জোন স্থির করা, দমকল ও অ্যাম্বুলেন্সের আপৎকালীন যাতায়াতের পথ ফাঁকা রাখা, মহিলা খরিদ্দার-দোকানদার-দোকান কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ছিল দুর্নীতি দূর করার দাবি।

দোকানদাররা বলেছেন, তাঁদের আন্দোলন হকারদের বিরুদ্ধে নয়, কিছু রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও কলকাতা কর্পোরেশন আধিকারিকরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটস্থ করে গরিব হকারদের রাস্তার উপর বসিয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

সমগ্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেডারেশনের নেতৃত্বে। দোকানদাররা ঘোষণা করেছেন, এরপরও যদি তাঁদের দাবি পূরণ না হয়, তা হলে আগামী দিনে তাঁরা অনির্দিষ্টকালীন বনধের দিকে যাবেন।

সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের ভেবে দেখা দরকার

তিনের পাতার পর

ভ্রান্ত বিশ্লেষণ, নেতা-কর্মীদের উন্নত সংস্কৃতি বর্জিত বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি প্রভাবিত আচার-আচরণ— সব কিছুই প্রমাণ করে দলটি আদৌ একটি কমিউনিস্ট পার্টি নয়, কমিউনিস্ট নাম নিয়ে আসলে একটি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। সিপিএমের আজকের পরিণতি তাঁর এই বিশ্লেষণকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে।

সম্প্রতি সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে শোনা যাচ্ছে তাঁরা নাকি শুদ্ধিকরণ করছেন। শুদ্ধিকরণ মানে তো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া, দলকে ভুল-ত্রুটি থেকে, বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করা। শুদ্ধিকরণের নামে বাস্তবে তাই কি ঘটছে? নেতারা জনসমর্থন ফিরে পাওয়ার কথা বলছেন। বলছেন, কর্মীদের ঔদ্ধত্যের জন্য নাকি মানুষ মুখ ফিরিয়েছে, কর্মীরা নাকি জনসংযোগ হারিয়েছেন। অর্থাৎ নেতারা দলের আজকের এই পরিণতির যথার্থ কারণটিকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু নিচের তলার কিছু কর্মীকে বলির পাঁঠা করার নাম দিয়েছেন শুদ্ধিকরণ। কিন্তু যে কর্মীরা একদিন বিপ্লবের, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে দলে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের আজ এই পরিণতি হল কেন? শুরুতে দলের কর্মীদের মধ্যে যে আবেগ ছিল, নিষ্ঠা ছিল, ত্যাগের মানসিকতা ছিল, সরকারে থাকার ফলে সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেল কেন? তার দায়িত্ব কি শুধু কর্মীদের? রিগিং, বুথ দখল কি কর্মীরা নেতৃত্বের নির্দেশেই করেননি? বিরোধীদের উপর হামলা করা, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, খুন করা, মহিলাদের নির্যাতন করা, এসব কি নেতৃত্বের অজ্ঞাতসারে হয়েছিল? না হলে কি তা দশকের পর দশক ধরে রাজ্য জুড়ে চলতে পারত? গণআন্দোলনের রাজনীতিকে ভোটের রাজনীতিতে পরিণত করেছিল কারা? নির্বাচনে যে কোনও উপায়ে বিরোধীদের হারানোই শ্রেণিসংগ্রাম বলে বুঝিয়েছিল কারা? দলের নেতারাই নয় কি? সে দায়িত্ব স্বীকার না করে, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম দলের মধ্যে শুরু না করে, কর্মীদের চোখে ধুলো দিতে 'কিছু কিছু প্রশ্নে আমাদের ভুল হয়েছে' বলার দ্বারা আদৌ কোনও শুদ্ধিকরণ হতে পারে কি? সিপিএম নেতারা আজ কর্মীদের ত্রুটিমুক্ত হওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু তাঁরা নিজেরা কি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে নিজেদের অন্যায় যথার্থ ভাবে স্বীকার করেছেন? স্বীকার তো করেনইনি, উপরন্তু, 'স্থানীয় নেতৃত্বই এর জন্য দায়ী' ইত্যাদি নানা কথার প্যাঁচে আজও কর্মীদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এর নাম কি শুদ্ধিকরণ?

এ প্রসঙ্গে মহান লেনিনের একটি অমূল্য শিক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'লেফট উয়িং কমিউনিজম— অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার' রচনায় বলছেন, "একটি কমিউনিস্ট পার্টি কতটা শ্রমিক শ্রেণির ও শোষিত জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও সিরিয়াস, সেটা বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে, সেই দল ভুলের প্রতি কী মনোভাব গ্রহণ করে। খোলাখুলিভাবে সেই ভুল স্বীকার করা, ভুলের কারণগুলো খুঁজে বের করা, কোন পরিস্থিতিতে এই ভুলগুলি জন্ম নিয়েছিল সেটা বিশ্লেষণ করা, একে কী উপায়ে সংশোধন করা যায় সেটা গুরুত্ব সহকারে বিচার করা— এই দৃষ্টিভঙ্গিই একটা কমিউনিস্ট দলের সিরিয়াসনেসের লক্ষণ। এটাই তার কর্তব্য পালনের প্রমাণ। এইভাবে সেই দল নিজেকে, শ্রমিকশ্রেণিকে এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে।" ভুল সংশোধনের এই লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণের কোনও চেষ্টা সিপিএমে দেখা গেল কি? আবার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' গ্রন্থে ভুল সম্পর্কে বলছেন, "একটি দল শুধুমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেকে জাহির করছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভোকাবুলারির সাহায্যে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করছে, অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করছে না, মানেই হচ্ছে— সে দলটি জ্ঞাতসারেই হোক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক— মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সাম্যবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই আসলে অন্য কোনও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। তাই ভুল করে ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়, ভুলের চরিত্র নির্ধারণই মার্কসবাদীদের কাছে মূল বিচার্য বিষয়।" সিপিএম নেতারা কি মার্কসবাদী রীতি অনুযায়ী তাঁদের ভুলের চরিত্র নির্ধারণ করছেন? তাঁদের বক্তব্যে তার চেষ্টা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বরং তাঁদের মরিয়া চেষ্টা দেখা যাচ্ছে কীভাবে রাজ্যে তাঁরা হারানো গদি ফিরে পেতে পারেন তাতেই। এই রাজনীতির চর্চার দ্বারা এমএলএ এমপি-র সংখ্যা বাড়তে পারে, বামপন্থা ও বামপন্থী গণআন্দোলন শক্তিশালী হবে কি? যথার্থ বামপন্থী কর্মী-সমর্থক, যাঁরা আজ দলের পরিণতি দেখে চোখের জল ফেলছেন, তাঁদের অবশ্যই দলের মধ্যে সাহসের সাথে এই সব প্রশ্ন তুলতে হবে, নেতৃত্বের কাছ থেকে এর স্পষ্ট উত্তর চাইতে হবে, নেতৃত্বকে বাধ্য করতে হবে গণআন্দোলনের কর্মসূচি নিতে।

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় মহান কার্ল মার্কসের জন্মদিন ৫ মে-র পরিবর্তে ৫ মার্চ ছাপা হয়েছে। এই গুরুতর ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

অন্ধ্রপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের জয়

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলা গত ১২৫ বছর ধরে বহুবার খরায় পুড়েছে। যতদিন যাচ্ছে খরা আরও ঘন ঘন আসছে। এখানে গড় বৃষ্টিপাত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় নিম্নতম, রাজস্থানের জয়শলমিরের পরেই এর স্থান। পানীয় জল ও সেচের জলের ভীষণ অভাব। বাধ্য হয়েই মানুষকে জল কিনে খেতে হচ্ছে।

রাজ্যে কংগ্রেস এবং তেলেগু দেশম পার্টি বহু বছর ধরে শাসন করলেও জনজীবনের এই মারাত্মক সমস্যা সমাধানে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৯৩-৯৪ সালে 'হন্দ্রি-নিভা সুজলা শ্রাবন্তি'সেচ প্রকল্প প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে রায়লসীমা এলাকার কুর্নুল,অনন্তপুর, কাডাপা এবং চিতোর জেলার ৬ লক্ষ ২ হাজার ৫০০ একর জমি সেচসেবিত করা যেত। কিন্তু উপরোক্ত দুই দলের ক্ষমাহীন অবহেলায় ২০ বছর পার হলেও প্রকল্পের ৬৬ শতাংশের বেশি কাজ বাকি পড়ে রয়েছে। মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছে দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শেষ না করলে অনন্তপুর জেলা মরুভূমিতে পরিণত হবে।

এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) হিন্দুপুর টাউন সাংগঠনিক কমিটি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রকল্পের কাজ শেষ করার দাবিতে আন্দোলনে নামে। মানুষ ব্যাপক সাড়া দেয়। হিন্দুপুরের ৪৫টি গ্রামে বহু সভা হয়। লক্ষ লক্ষ হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় গণউদ্যোগ। গড়ে ওঠে নাটকের গ্রুপ। তারা নাটকের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এলাকার বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্ন করতে থাকে সমস্যার সমাধান কবে হবে? এই চাপ এম এল এ কে বাধ্য করে সেচমন্ত্রী ও প্রকল্প অধিকারিকদের জরুরি বৈঠক করে বিষয়টি পর্যালোচনার। আন্দোলনের এই ধারায় ২ মার্চ হিন্দুপুরে কনভেনশন ডাকা হয়। কৃষকরা তাদের ট্রাক্টরগুলি ব্যানার ফেস্টুনে সাজিয়ে স্লোগান তুলে কনভেনশনে সামিল হন।

কনভেনশনের আগে হিন্দুপুরে বিশাল মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন, এস ইউ সি আই (সি) অনন্তপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বি এস অমরনাথ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) হিন্দুপুর টাউন কমিটির সম্পাদক কমরেড গিরীশ। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (সি) অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড কে শ্রীধর সরকারি অবহেলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কেন সরকার প্রকল্পটিকে এ আই বি পি-র (অ্যাকসিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রোগ্রাম)-এর অন্তর্ভুক্ত করেনি? কেন সরকার নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট) থেকে ঋণ নেয়নি? কনভেনশনে 'অনন্তপুর ডিস্ট্রিক্ট ইরিগেশন ওয়াটার স্ট্রাগল কমিটি'র সম্পাদক জি রামনজিনেয়ুলু প্রকল্পের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কনভেনশন থেকে কমরেড গিরীশকে আহ্বায়ক করে ৩০ সদস্যের 'হন্দ্রি-নিভা জল সাধনা সমিতি' গঠিত হয়। কনভেনশন দাবি করে এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে এবং এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ মার্চ সেচমন্ত্রী এবং ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তারপরই বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য সরকার ২১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এস ইউ সি আই(সি) একে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ জয় আখ্যা দিয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যনীতি চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নেওয়ার 'নীল নক্সা' — মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে নতুন 'খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি— ২০১৫' স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দিয়েছে তাকে স্বাস্থ্যের অধিকার হরণের ব্লু-প্রিন্ট আখ্যা দিয়েছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। ১০ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র বলেন, এই নীতিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে চিকিৎসার সুযোগ পেতে হলে প্রতিটি ভারতবাসীকে স্বাস্থ্যকার্ড করতে হবে এবং ওই কার্ড ছাড়া চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই কার্ড কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং তার জন্য রোগীকে কী পরিমাণ ব্যয় করতে হবে, তার কোনও উল্লেখ খসড়ায় নেই। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যপরিষেবাকে সম্পূর্ণরূপে বিমা নির্ভর করতে চলেছে। আর এই স্বাস্থ্যবিমার দেয় টাকা মানুষকে আগেই মেটাতে হবে। এর দ্বারা বিমা কোম্পানিগুলিই লাভবান হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, বিমা-নির্ভর চিকিৎসা আর স্বাস্থ জাতীয়করণ এক জিনিস নয়। বিমা-নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আসলে চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যবসায়ীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে চলেছে। তিনি বলেন, এ কাজ শুরু হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মধ্য দিয়ে। এর ফলে মানুষকে চিকিৎসার জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে স্বাস্থ্য কর দিতে হবে। মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার হারাবে।

তিনি বলেন, ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক, ব্লক, মহকুমা, জেলা হাসপাতালগুলিতে যে পরিকাঠামোগত বিপুল ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের কোনও প্রস্তাব নেই এই খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে। এই খসড়া নীতিতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে আয়ুশ (আয়ুর্বেদিক, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা, হোমিওপ্যাথি) চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহারের জন্য বলা হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যাপারটি যেহেতু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে যুক্ত, তাই এটি কখনোই আয়ুশের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। আয়ুশ এম বি বি এস চিকিৎসকের টিমে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু বিকল্প ভূমিকা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করবে।

সংগঠনের সদস্য ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, গ্রামীণ চিকিৎসা-বঞ্চিত মানুষের ৪০ শতাংশের চিকিৎসা নন-রেজিস্টার্ড গ্রামীণ ডাক্তাররা করেন। তাঁদের সম্পর্কে খসড়ায় কিছু বলা হয়নি। অথচ উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে এঁদের স্বাস্থ্যপরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেত। এই নীতিতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করার কথা বলা হয়েছে জি ডি পি-র মাত্র ২.৫ শতাংশ। অথচ ভোর কমিটি বলেছিল ১০ শতাংশ এবং 'হু' বলেছে কমপক্ষে ৫ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। মুখে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা বলতে বলতেই কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যবাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে। ডাঃ অশোক সামন্ত জানান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যনীতির এইসব জনবিরোধী দিকগুলি বর্জন করার জন্য তাঁরা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে তাঁদের বিকল্প প্রস্তাবগুলি জমা দিয়েছেন।

সরকারের কোনও হেলদোল নেই

একের পাতার পর

কার্যক্ষেত্রে তাদের স্বার্থই এই দলগুলি দেখে।

বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ সহ সমস্ত প্রকার কৃষি উপকরণের দাম অত্যধিক হারে বেড়ে চলেছে প্রতি মরশুমে। অথচ কৃষক আলুর দাম পাচ্ছে কেজিতে ২-৩ টাকা। অসাধু ব্যবসাদার, কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ উচ্চমূল্যে আলু কিনতে বাধ্য হলেও মহাজনী দেনায় বিপন্ন আলুচাষিরা নামমাত্র মূল্যে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এ বছরও ফড়েরা, আড়তদাররা বস্তায় (৫০ কেজি) ১২০-১৩০ টাকার বেশি দাম দিচ্ছে না। চাষের জন্য নেওয়া ঋণ শোধ দিতে না পেরে নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে যাচ্ছে চাষিরা, পরিবার নিয়ে পথে বসতে বাধ্য হচ্ছে। বৃহৎ জমির মালিক ছাড়া ক্ষুদ্র-মধ্যবিত্ত চাষিদের কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডও নেই। ফলে কৃষিঋণও পাচ্ছেন না তাঁরা। চাষিকে মহাজনের থাবার মধ্যে এভাবে ঠেলে না দিয়ে স্বল্প সুদে ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে তবু কিছুটা সুরাহা হত। কিন্তু তার জন্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই।

একদিকে সরকারের দায় ঝেড়ে ফেলা, অন্যদিকে সরকারি বিজ্ঞাপন 'চাষিদের পাশে আছি, চাষিদের পাশে থাকব'। সত্যিই কি সরকার চাষিদের পাশে আছে, তা জানতে হাজির হয়েছিলাম হুগলির মহেশ্বরপুর এলাকায়। মূলত আলু চাষের উপরেই এই এলাকা যেমন, তেমনই গোটা জেলার অর্থনীতি নির্ভর করে। অধিকাংশ পরিবারের সারা বছরের খরচ জোগায় আলু। এ বছর ফলনও ভালো। কিন্তু দাম না পাওয়ায় মাঠের পর মাঠ জুড়ে বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে আলু। এমনকী বহু মাঠের আলু তোলাও হয়নি। মজুরের দামটুকুও উঠছে না। চাষিরা জানালেন, বস্তা প্রতি ৩০০-৩৫০ টাকা পেলে অল্প কিছু লাভ রেখে কোনও মতে সংসার চলে যায়। সেখানে এ বছর প্রতি বস্তা ১২০—১৩০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে একাংশ সংগঠিত হয়ে চেষ্টা করছেন তাঁদের অসহায়তার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরতে। সরকার ও প্রশাসনের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টায় গড়ে তুলেছেন 'আলু চাষি সংগ্রাম কমিটি'। কমিটির নেতৃত্বে মহেশ্বরপুরে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের নিচে তারকেশ্বর-চুঁচুড়া এবং পাণ্ডুয়া-সিঙ্গুরগামী চার রাস্তার মোড় অবরোধ করে কৃষকরা রাস্তায় আলু ছড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। ১৩ জানুয়ারি বিক্ষোভে সামিল এমনই কয়েকজনকে পাওয়া গেল, যারা শুধু একদিনের বিক্ষোভ নয়, প্রশাসনের কানে জল ঢোকাতে এমনকী কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তাদের দাবি জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জিয়ারুল হক সরদার হুগলির কেশবপুর গ্রামের চাষি। আলু চাষ করে আসছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। চাষই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন এ বছর। ছলছল চোখে বললেন, এ বার একখানা আলুও বেচতে পারিনি। সরকার সহায়ক মূল্যে আলু কিনবে বলছে যে? প্রশ্ন শুনে তাঁর দীর্ঘশ্বাস লুকোতে পারলেন না। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আমরা কিছু পাচ্ছি না, ওগুলো শুধু কাগজেই ছাপা হচ্ছে।'

পোলবা-দাদপুর ব্লকের আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক গদাধর পান নিজের তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। তিনি বলেন, সরকার আলু কিনবে ভেবে আশা দেখেছিলাম। কিন্তু হতাশ হতে হল যখন দেখলাম ১ কেজি আলুতে যেখানে ৫-৬ টাকা খরচ হচ্ছে আমাদের, সেখানে সরকার সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা। বলুন তো, যখন ওড়িশা বিহার ঝাড়খণ্ড সরকার আলু চাষে ভর্তুকি দিয়ে চাষ করাচ্ছে, সেখানে এই সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে না কেন? ভেবেছিলেন, আলু বিক্রি করে ভাগ্নের কিডনির চিকিৎসা করাবেন। এই অবস্থায় চিকিৎসা দূর অস্ত, সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, সরকার চাষির কথা ভাবছে না, ব্যবসায়ীরা যাতে সস্তায় আলু কিনে হিমঘরে মজুত করতে পারে তার জন্য দাম কমিয়ে

১৩ মার্চ। রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ মহেশ্বরপুরের চাষিদের

চাষিদের কম দামে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। চাষিদের মুখেই শোনা গেল, হিমঘরে আলু রাখার বন্ড প্রশাসনই বিক্রি করে দিয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে। আর কৃষি বিপণন মন্ত্রী টিভি ক্যামেরার সামনে বাইট দিচ্ছেন, সরকার কৃষকদের পাশে আছে! কীরকম পাশে আছে তাও দেখা গেল, চাষিদের কারও থেকে সামান্য কিছু আলু নিয়মরক্ষার্থে হিমঘরে তোলা হলেও তাতে শাসক দলের স্ট্যাম্প দেওয়া টোকেন দেখাতে হচ্ছে। বেশ কয়েকজন চাষি জানালেন, টোকেন জোগাড় করতে হলে শাসক দলের নেতাদের খুশি করতে হবে, নজরানাও লাগছে। আমরা চাষিরা যাব কোথায়? বললাম, কপাল চাপড়ে কি এর উত্তর মিলবে? হোদলা গ্রামের আলু চাষি জয়ন্ত মুদি এগিয়ে এলেন। জানালেন, তাঁরা উত্তর খুঁজতে চান আন্দোলনের রাস্তায়। সমর্থন পাওয়া গেল প্রায় সবার কাছ থেকে।

এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল সারা বাংলা আলু চাষি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরীর কণ্ঠে। তিনি বললেন, শুধু আজকের রাস্তা অবরোধ নয়, এমন অবরোধ সারা রাজ্য জুড়ে চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আলু চাষিরা প্রতিরোধে নামছেন। এরপরেও আন্দোলন চালিয়ে যাব আমরা। কলকাতায় ২০ মার্চ এ আই কে কে এম এস-এর ডাকা কৃষক বিক্ষোভে যোগ দেব। লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে কেজি প্রতি অন্তত ৮ টাকা দরে আলু কিনতে বাধ্য করব আমরা। কৃষকের ঋণ মকুব করানোর দাবি জানাব এবং অভাবি কৃষক ও আত্মঘাতী কৃষক পরিবারের সদস্যদের সরকারি সহায়তা দেওয়ার দাবি নিয়ে এই আন্দোলন চলবে।

সরকার শুনুন, চাষিরা তাঁদের উত্তর আন্দোলনের রাস্তাতেই খুঁজে পাচ্ছেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রেলযাত্রীদের সমস্যা নিয়ে দিল্লিতে এস ইউ সি আই (সি) প্রতিনিধি দল

সমাধানের আশ্বাস রেলমন্ত্রীর

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার রেলযাত্রীদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি নিয়ে দিল্লিতে রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর সাথে আলোচনায় বসলেন এস ইউ সি আই (সি) প্রতিনিধি দল। জয়নগরের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর, প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল ১২ মার্চ রেলমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সমস্যাগুলি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। প্রতিনিধিরা রেলমন্ত্রীকে জানান, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা, বিশেষত রেল পরিষেবার অব্যবস্থা দীর্ঘদিনের। দলের পক্ষ থেকে সমস্যাগুলির সমাধানে যাত্রীদের সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ডাঃ তরুণ মণ্ডলের সাথে কথা বলিয়ে দেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, কমরেডস অজয় সাহা, মাদার লস্কর ও বাদল সরদার। প্রতিনিধিরা রেলমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিতে যে দাবিগুলি তুলে ধরেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নামখানা-শিয়ালদহ, ক্যানিং-শিয়ালদহ, ডায়মন্ডহারবার শিয়ালদহ লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত আধঘণ্টা অন্তর ট্রেন চালানো; জয়নগর, দক্ষিণ বারাসাত, মগরাহাট ও ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অন্তত পক্ষে অফিস টাইমের ভিড় কমানোর জন্য লোকাল ট্রেন চালু; নামখানা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে বারুইপুর ও সোনারপুর, মথুরাপুর থেকে সোনারপুর পর্যন্ত সাটল ট্রেন, বিশেষত অফিস টাইমে চালানো; মথুরাপুর ও লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের মধ্যে ডবল লাইনের কাজ দ্রুত শেষ করা; স্টেশনে আসার রাস্তাগুলি সংস্কার; স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলি উঁচু কর; চাঁদখালি হল্ট স্টেশনের কাজ অবিলম্বে শেষ করা; জয়নগর আপ স্টেশনের টিকিট কাউন্টার ও তৃতীয় লাইন চালু; ক্যানিং থেকে ভাঙনখালি-বাসন্তী-গদখালি-ঝড়খালি, জয়নগর থেকে রায়দিঘি, নামখানা থেকে বকখালি, জয়নগর থেকে জামতলা-কিশোরীমোহনপুর পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারণ; হকার-ভেন্ডার-ছোট ব্যবসায়ীদের স্টেশন থেকে উচ্ছেদ না করা; ক্যানিং স্টেশনে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের পুনর্বাসন, পোশাক বিক্রেতাদের জন্য মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন প্রতিনিধিরা

দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। এর আগে বহুবার তাঁরা শিয়ালদহ বিভাগের ডি আর এম, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং পূর্বতন রেলমন্ত্রীদের কাছে দাবিগুলি তুলে ধরেছেন। প্রশাসনের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য রেলযাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ, বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষোভ, এমনকী রেল অবরোধ পর্যন্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির যথার্থতা স্বীকার করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ শুরু হলেও সেগুলির অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। আবার অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক সংকটের কথা তোলা হয়েছে। বর্তমান রেলমন্ত্রী যেন দাবিগুলি পূরণ করে অনুন্নত সুন্দরবন এলাকার মানুষের কাছে উন্নত ও আরও বিস্তৃত রেল পরিষেবা পৌঁছে দেন প্রতিনিধি দল তার অনুরোধ জানান। রেলমন্ত্রী দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন এবং সাথে সাথে শিয়ালদহ ডি আর এমকে ফোনে এ সংক্রান্ত

এ আই ইউ টি ইউ সি-র
২১তম রাজ্য সম্মেলন
২৯ মার্চ মৌলালী যুবকেন্দ্র, সকাল ১০ টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী
(সর্বভারতীয় সভাপতি এ আই ইউ টি ইউ সি)

শরদ যাদবের এম পি পদ বাতিল করা হোক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে শরদ যাদবের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ মার্চ এক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৩ মার্চ রাজ্যসভায় বিমা বিল নিয়ে বিতর্কে অংশ নিয়ে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর এম পি শরদ যাদব দক্ষিণ ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে যে জঘন্য ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। অপরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের মন্তব্য আসে বিকৃতকামী ও নারীবিদ্বেষী মানসিকতা থেকে, যা আইনসভায় আসীন একজন জনপ্রতিনিধির পক্ষে একেবারেই বেমানান। বিভিন্ন দলের পুরুষ সদস্যরা যেভাবে এই অশ্লীল মন্তব্যের প্রতিবাদ না করে মজা উপভোগ করেছেন, তাতে তাঁদেরও সাংস্কৃতিক মান কোথায় নেমেছে তা-ও বোঝা যায়। এটাও সমানভাবে নিন্দনীয়। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির সদস্য ডি পি ত্রিপাঠি আবার কবি কালিদাসের আদিরসাত্মক কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফোড়ন কেটেছেন। আরও লজ্জাজনক হল, যখন ডি এম কে সদস্য কানিমোঝি নারীর মর্যাদাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্মান করার প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন, তখন পুরুষ সদস্যরা তাঁকে এই বলে চুপ করাবার চেষ্টা করেছেন যে, এসব নিছক ঠাট্টা! গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নয়।

আজ দেশে যখন ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন সহ নারী নির্যাতন বেড়ে চলেছে, কায়েমি স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন পরিকল্পিতভাবে নারীকে ভোগের বস্তু হিসাবে দেখাতে চাইছে এবং এর দ্বারা সমাজে নৈতিকতার ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে, তখন দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সদস্যদের এই ধরনের লাম্পট্যপূর্ণ মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাবে এবং নারীর শ্লীলতায় আঘাত করতে দুষ্কৃতীদের উৎসাহিত করবে। আমরা তাই দাবি করছি যে, অবিলম্বে শরদ যাদবের এম পি পদ বাতিল করা হোক এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা এই কুরুচিকর মস্করায় যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদেরও তিরস্কার করে রাজ্যসভার মর্যাদা রক্ষা করা হোক।

জেলায় জেলায় আলুচাষিদের বিক্ষোভ, অবরোধ

কেজি প্রতি ৮ টাকা সহায়ক মূল্যে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে আলু কেনার দাবিতে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে ৯ মার্চ বাঁকুড়া শহরের ধলডাঙা মোড়ে ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা। অবরোধে কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া-১, রানিবাঁধের কৃষকরা সামিল হন। পরে বাঁকুড়া সদর মহকুমাশাসকের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক তারাশঙ্কর গোপ, জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জয় ভুঁইঞা, জেলা সভাপতি দিলীপ কুণ্ডু।

এ আই কে কে এম এস পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে ১৩ মার্চ শতাধিক আলুচাষি তমলুকে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে প্রবল বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য উৎপল প্রধান, বিবেক রায়, প্রবীর প্রধান, স্বপন সামন্ত। সংগঠনের যুগ্ম সহসভাপতি গোষ্ঠ কুইল্যা, নারায়ণ নায়েক এ ডি এম-এর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ৮ টাকা কিলো দরে আলু কেনা এবং মৃত কৃষক পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

হুগলির বৈঁচিতে দলের উদ্যোগে কৃষকরা আলুর বস্তা ফেলে রাস্তা অবরোধ করে। বর্ধমানের কালনা, মেদিনীপুরের শালবনি, মেদিনীপুর শহরেও বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ হয়।

বর্ধমানের ভাতার ব্লকের ছাতিমডাঙা গ্রামের আলুচাষি গুড্ডু মুর্মু আলুর দাম না পেয়ে আত্মঘাতী হন। ১১ মার্চ দলের বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দেবু চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মৃতের পরিবারের সাথে দেখা করেন। ঐদিন এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকেও ভাতার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং তাদের সমস্ত ঋণ মকুবের দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ-অবরোধে সামিল হন আলুচাষিরা।

গুড্ডু মুর্মুর বাড়িতে দলের প্রতিনিধিরা

কৃষকদের দুর্দশার জন্য সরকারের কৃষকবিরোধী নীতিই দায়ী
এ আই কে কে এম এস

রাজ্য জুড়ে আলুচাষিদের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এ আই কে কে এম এসের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান ১৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যের আলুচাষিদের এই দুর্দশার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষকবিরোধী নীতিই দায়ী। তিনি দাবি করেন, আলুচাষিদের বর্তমান সঙ্কট দূর করার জন্য অবিলম্বে ৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু কেনার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে আলু ক্রয়কেন্দ্র খুলতে হবে, আলুচাষিদের সমস্ত ঋণ মকুব করতে হবে। তিনি আত্মহত্যাকারীদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিওজানান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in